

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যমিলি ল (পারিবারিক আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আমির তানজিনা

রোলঃ 23100120116

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যামিলি ল (পারিবারিক আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আমির তানজিনা

রোলঃ 23100120116

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ফ্যামিলি ল (পারিবারিক আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা আমির তানজিনা, আইডিঃ 23100120116 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ফ্যামিলি ল (পারিবারিক আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়েশা আমির

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আয়েশা আমির তানজিনা

আইডিঃ 23100120116

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: ভূমিকা.....	6
১.১ ভূমিকা.....	6
১.২ পারিবারিক আইনের সংজ্ঞা.....	7
অধ্যায়-২:বিবাহ সম্পর্কিত মৌলিক বিধান.....	8
২.১ বিয়ের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব.....	8
২.২ বিয়ের উপযুক্ত সময়.....	10
২.৩ বিয়ের হুকুম.....	11
২.৪ যাদের সাথে বিয়ে হারাম.....	12
২.৫ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন.....	14
২.৬ অভিভাবকের(ওয়ালী) ভূমিকা.....	19
২.৭ মোহরানা.....	21
২.৮ বিবাহের অনুষ্ঠান ও ওলীমা.....	24
অধ্যায়-৩:পারিবারিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব.....	27
৩.১ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব.....	27
৩.২ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি: ভালোবাসা, দয়া ও বন্ধুত্ব.....	28
৩.৩ সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব.....	29
অধ্যায়-৪:বিচ্ছেদ ও পরবর্তী বিধান.....	31
৪.১ তালাক.....	31
৪.২ খুলা তালাক (স্ত্রীর বিচ্ছেদের অধিকার).....	35
৪.৩ ইদত.....	37
৪.৪ উত্তরাধিকার.....	39
অধ্যায়-৫ আধুনিক সমাজে পারিবারিক জীবনের চ্যালেঞ্জ.....	42
৫.১ বাল্যবিবাহ.....	42

৫.২ হারাম সম্পর্ক ও অবাধ মেলামেশা.....	43
৫.৩ পরকীয়া	44
৫.৪ ক্যারিয়ার ও বিয়ের দ্বন্দ্ব.....	45
৫.৫ যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন	46
অধ্যায়-৬:উপসংহার	48

অধ্যায়-১: ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি শুকরিয়া। তিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং দ্বীন ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দান করেছেন। ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ইবাদত, আচার-আচরণ, নৈতিকতা, পরিবার ও সমাজ—সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতাতা'লা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করতে হবে।

পবিত্র কুরআন এ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

তোমরা আল্লাহ্ র 'ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাস্তিক, অহংকারীকে। (আন-নিসা ৪:৩৬)

সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার মানুষের চরিত্র গঠন, নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, আধুনিকতার ভুল ব্যাখ্যা এবং প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে পারিবারিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন

লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি, পারিবারিক কলহ, নারীর অধিকার নিয়ে বিভ্রান্তি এবং সন্তান লালন-পালনে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে পারিবারিক আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

১.২ পারিবারিক আইনের সংজ্ঞা

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানব সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক, যেখানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে একত্রে বসবাস করে। এই পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য যে নিয়ম-কানুন ও বিধান নির্ধারিত হয়েছে, তাকে **পারিবারিক আইন** বলা হয়।

পারিবারিক আইনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে—বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার, সন্তানের লালন-পালন ইত্যাদি। ইসলামি শরীয়াহর আলোকে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পরিবারে শান্তি, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশসহ মুসলিম সমাজে পারিবারিক আইন ইসলামি শরীয়াহর ভিত্তিতে গঠিত হলেও আধুনিক সমাজের পরিবর্তনের কারণে এর প্রয়োগে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দেখা দিচ্ছে। তাই পারিবারিক আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায়-২:বিবাহ সম্পর্কিত মৌলিক বিধান

২.১ বিয়ের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

বিবাহ হলো একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগতভাবে স্বীকৃত একটি সম্পর্ক, যার মাধ্যমে তারা একসাথে জীবনযাপন করে এবং একটি পরিবার গঠন করে এবং পারস্পরিক দায়িত্ব পালন করে। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বিয়ে (নিকাহ) হলো একটি পবিত্র চুক্তি, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় এবং এটি মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

বিয়ের মাধ্যমে মানবজীবনে পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি হয়, ইজ্জত-আব্রার হেফাজত হয়, চারিত্রিক পবিত্রতা নিশ্চিত হয়। এছাড়াও এতে বৈধ বংশ বিস্তার সহ রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন বহু খায়ের ও বরকত।

মানববংশ বিস্তার করা ও ধ্বংসের হাত থেকে মানববংশকে হেফাজত করা। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

دَنَّا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ، مَنْصُورُ بْنُ رَازَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي ابْنَ رَازَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ " لَا " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاةً ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ " .

মা'ক্কিল ইবনু ইয়াসার(রহ:) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে বন্ধা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? তিনি বললেনঃ না। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট

এলে তিনি তাকে বললেনঃ এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো।(সুনানে আবু দাউদ,হাদিস-২০৫০)

বিয়ে চক্ষু শীতল করে।বিয়ে মানুষকে অবৈধ সম্পর্ক থেকে দূরে রাখে এবং চরিত্র পবিত্র রাখতে সাহায্য করে।বলা বাহুল্য ইসলামী শরীয়তে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিবাহকে ঈমান ও দ্বীনের অর্ধেক বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي

অর্থাৎ বান্দা যখন বিবাহ করে তখন তার দ্বীন অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব, সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে থাকে। (শুআবুল ঈমান, হাদীস ৫৪৮৮)

বিবাহের মাধ্যমে অন্তরের অসওয়াসা ও অবৈধ কামনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ

"তারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের পত্নী বা অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।"(সূরা মা'আরিজ,আয়াত:২৯-৩০)

বিয়ের মাধ্যমে জান্নাতের পথ সহজ হয়। বিয়ের মাধ্যমে লজ্জাস্থান হেফাজত হয়। বিয়ের মাধ্যমে রিজিক বাড়ে,আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। অন্তরের প্রশান্তি বাড়ে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়, ফলে মানসিক প্রশান্তি আসে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا
خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَتَتْكُمْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لِئِنْ أَتَيْتُنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ ۚ

“তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। এরপর যখন সে তার সঙ্গে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে আর তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ র নিকট প্রার্থনা করে, ‘যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই।’

(সূরা আরাফ, আয়াত:১৮৯)

২.২ বিয়ের উপযুক্ত সময়

সাধারণত কোন মেয়ে ৯ বছরের পূর্বে, আর কোন ছেলে ১২ বছরের পূর্বে বাল্যেগ হয় না। ১৫ বছরের পর কেউ বাল্যেগ থাকে না। বাল্যেগ হওয়ার কোন নিদর্শন পাওয়া গেলে ছেলে মেয়ে কে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হবে।

সুতরাং যেসব মেয়েদের বয়স ৯-১৭ বছর, তারা কেউ নাবালিকা নয়, আবার যেসব ছেলেদের বয়স ১২-১৭ বছর, তারাও কেউ নাবালক নয়। তারা যদি প্রেম করতে পারে, এই বয়সে অবৈধ সম্পর্কে জড়তে পারে, তাহলে এই বয়সে বিয়ে করলে সেটা বাল্যবিয়ে হবে কেনো? যে বুঝে তার বিয়ে করা দরকার, সে অবশ্যই বুঝমান ব্যক্তি, তাকে আপনি নাবালক বলতে পারেননা।

তাই বিয়ের বয়স ছেলেদের ২১ বছর, আর মেয়েদের ১৮ বছর-এরকম নির্দিষ্ট করে ইসলামি শরীয়তে বলা নেই, তাই কোন মানবরচিত আইনের অধিকার নেই বলপ্রয়োগ করার, যখন আল্লাহ তায়ালা বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

যেহেতু ছেলে-মেয়ের বৈশিষ্ট্যগত ভাবেই জৈবিক চাহিদা চলে আসে বাল্যেগ হওয়ার পর তাই উচিৎ তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা।

কারণ দেরিতে বিয়ে ছেলে মেয়েদের মানসিকভাবে অসুস্থ করে দেয়।

২.৩ বিয়ের হুকুম

ইসলামে বিয়ের হুকুম সবার জন্য একরকম নয়; বরং ব্যক্তির শারীরিক চাহিদা, আর্থিক সামর্থ্য ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে এর বিধান ভিন্ন হয়ে থাকে। ফকীহগণ সাধারণত বিয়ের হুকুমকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. ওয়াজিব বিয়ে

যদি কোনো ব্যক্তির বিয়ের প্রতি চাহিদা থাকে এবং সে নিজের ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বহনের সামর্থ্য রাখে, তাহলে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় বিয়ে থেকে বিরত থাকলে গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২. ফরজ বিয়ে

যদি কারো কামপ্রবৃত্তি এত বেশি হয় যে, বিয়ে না করলে ব্যভিচার বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে এবং তার বিয়ের সামর্থ্যও থাকে, তাহলে তার জন্য বিয়ে করা ফরজ।

৩. সুন্নত বিয়ে

যদি কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক চাহিদা থাকে এবং সে স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য বিয়ে করা সুন্নত। এ অবস্থায় বিয়ে না করলেও গুনাহ হবে না, যদি হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয় না থাকে।

৪. নিষিদ্ধ বা মাকরুহ বিয়ে

যদি কারো আশঙ্কা হয় যে, সে স্ত্রীর হক আদায় করতে পারবে না—চাই তা আর্থিক হোক বা শারীরিক—তাহলে তার জন্য বিয়ে করা অনুচিত। কারণ ইসলামে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা বৈধ নয়।

৫. সামর্থ্য না থাকলে করণীয়

যাদের বিয়ের ইচ্ছা আছে কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য নেই, তাদেরকে ইসলাম ধৈর্য ধারণ ও রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ রোজা মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। পাশাপাশি হালাল উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

হাদিস শরিফে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

আলকামাহ (রহ:) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে চলতে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম, তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। (বুখারি, হাদীস-১৯০৫)

২.৪ যাদের সাথে বিয়ে হারাম

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন। তাই কাদের সাথে বিবাহ বৈধ এবং কাদের সাথে অবৈধ—এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন—

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا

“নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট কাজ।”

— সূরা আন-নিসা : ২২

এরপর আল্লাহ তা‘আলা এমন নারীদের বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, যাদের সাথে বিবাহ হারাম। (সূরা আন-নিসা : ২৩-২৪)

ইসলামী শরীয়তে হারাম নারীদের দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—

১. মুহাররামাতে আবাদিয়্যাহ — যাদের সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম।
২. মুহাররামাতে মুয়াক্কাতাহ — যাদের সাথে সাময়িকভাবে বিবাহ হারাম।

১. মুহররামাতে আবাদিয়্যাহ (চিরস্থায়ী হারাম)

যেসব নারীর সাথে কোনো অবস্থাতেই বিবাহ বৈধ নয়, তাদেরকে চিরস্থায়ী হারাম বলা হয়। এরা তিন প্রকার—

ক. বংশগত সম্পর্কের কারণে হারাম

বংশগত সম্পর্কের কারণে সাত শ্রেণির নারী চিরতরে হারাম—

- মা, দাদী, নানী ও উর্ধ্বতন সকল নারী।
- কন্যা, নাতনী ও অধস্তন সকল নারী।
- আপন বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।
- ফুফু।
- খালা।
- ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজি)।
- বোনের মেয়ে (ভাগ্নি)।

এদের সকলের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ।

খ. দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম

কোনো শিশু নির্ধারিত বয়সের মধ্যে কোনো নারীর দুধ পান করলে তাদের মাঝে দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ঐ নারী শিশুর দুধমা এবং তার সন্তানরা দুধ ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“বংশগত সম্পর্কের কারণে যেসব সম্পর্ক হারাম হয়, দুধ সম্পর্কের কারণেও সেসব হারাম হয়।”

— সহীহ মুসলিম

অতএব দুধ মা, দুধ বোন, দুধ খালা, দুধ ফুফু প্রমুখের সাথে বিবাহ বৈধ নয়।

গ. শ্বশুরালয় সম্পর্কের কারণে হারাম

বিবাহের মাধ্যমে কিছু সম্পর্ক স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়। যেমন—

- স্ত্রীর মা, নানী ও দাদী।
- স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কন্যা (সহবাসের পর)।

- পুত্রবধূ।
- পিতার স্ত্রী।

এসব সম্পর্কের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ।

২. মুহাররামাতে মুয়াক্কাতা (সাময়িক হারাম)

কিছু নারী নির্দিষ্ট অবস্থায় সাময়িকভাবে হারাম হন। কারণ দূর হলে বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। যেমন—

- অন্যের স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করা।
- একসাথে দুই বোনকে বিবাহ করা।
- স্ত্রীর ফুফু, খালা বা ভাগ্নিকে স্ত্রীর উপস্থিতিতে বিবাহ করা।
- ইদত পালনরত নারীকে বিবাহ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“কোনো নারী ও তার ফুফু অথবা কোনো নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহে রাখা যাবে না।”

— সহীহ বুখারী

ইসলামের এসব বিধান পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত বিবাহের পূর্বে শরীয়তের এ বিধানগুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা।

২.৫ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

একটি সুখী, শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী দাম্পত্য জীবনের জন্য সঠিক পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্য, সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদার চেয়ে দীনদারিতা, উত্তম চরিত্র ও দায়িত্ববোধকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ জীবনসঙ্গী শুধু বর্তমান জীবনের সঙ্গী নয়; তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

আমাদের সমাজে অনেক সময় পাত্রী নির্বাচন করা হয় মূলত সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা বা সম্পদের ভিত্তিতে। এসব বিষয় সাময়িক আকর্ষণ সৃষ্টি করলেও দীর্ঘমেয়াদে দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্ব ও শান্তির নিশ্চয়তা দেয় না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ۖ
অর্থাৎ, “নারীকে চারটি বিষয়ের জন্য বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারিতা। অতএব তুমি দীনদার নারীকে প্রাধান্য দাও, তাহলে সফল হবে।”

— সহীহ আল-বুখারী, হাদিস: ৫০৯০

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দীনদারিতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। একজন দীনদার নারী আল্লাহভীরু হন, স্বামীর হক আদায়ে সচেতন থাকেন এবং সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে সচেতন ভূমিকা পালন করেন। বাহ্যিক সৌন্দর্য বা সম্পদ না থাকলেও দীনদার স্ত্রী সংসারে প্রশান্তি ও বরকত বয়ে আনেন।

অন্যদিকে, সমাজে প্রচলিত একটি ভুল ধারণা হলো— “বিয়ের পর দীনদার বানিয়ে নেওয়া যাবে।” বাস্তবে হিদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই শুরু থেকেই দীনদার ও চরিত্রবান জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা অধিক নিরাপদ ও কল্যাণকর।

পাত্রী নির্বাচনের সময় তার চরিত্র, লজ্জাশীলতা, পারিবারিক পরিবেশ, ইসলামী মূল্যবোধ ও সন্তান প্রতিপালনের মানসিকতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া উচিত। কারণ একজন মা-ই সন্তানের প্রথম শিক্ষক। মায়ের চরিত্র ও আদর্শ সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে।

পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথম দীনদারিতা ও চরিত্রকে প্রাধান্য দিতে হবে। অনেক অভিভাবক পাত্রের সরকারি চাকরি, বিদেশে অবস্থান বা বিপুল সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন; কিন্তু তার আয় হালাল কি না, চরিত্র কেমন, নামাজ-রোজা ও ইসলামী বিধান মানার মানসিকতা আছে কি না— এসব বিষয় উপেক্ষিত থাকে। অথচ এগুলোই একটি সফল দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি।

পাত্র নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা জরুরি:

- দীনদারিতা ও তাকওয়া

- উত্তম চরিত্র ও আচরণ
- হালাল উপার্জন
- স্ত্রীর ভরণপোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার সক্ষমতা
- শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা
- পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মানসিকতা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
অর্থাৎ, “পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর কিছু বেশিষ্টো শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে।”— সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, স্বামী পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তাই তার দ্বীনদার, আমানতদার, দায়িত্বশীল ও উত্তম আখলাকসম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

কুফু ও সমতা

এ কথা তো ঠিক যে, শরীয়ত বিবাহের ক্ষেত্রে একটি পর্যায় পর্যন্ত “কুফু” তথা সমতা রক্ষা করার কথা বলেছে, যার উদ্দেশ্য হলো এই যে, বিবাহ যেহেতু সারাজীবনে জন্য, বিয়ের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে যায় এজন্যে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের উভয়ের বংশে রুচি-প্রকৃতির মিল থাকা চাই। তাদের পরস্পরের জীবনাচার, চিন্তা-চেতনা, মেজাজ ও প্রকৃতির মধ্যে এত অধিক ব্যবধান না হওয়া চাই, যাতে একে অপরকে মেনে নিতে ও ঘর-সংসার করতে জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই “কুফু” সমতা রক্ষার অর্থ কখনই এই নয় যে, যদি এ সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে সারাজীবন বিবাহ না করার হলফ করতে হবে। দ্বিতীয়ত কুফু তথা সমতার অর্থ আদৌ এই নয় যে, কেবল নিজবংশেই বিবাহ করতে হবে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কেবল সৌন্দর্য, সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদাকে গুরুত্ব দিলে সাময়িক সন্তুষ্টি আসতে পারে; কিন্তু স্থায়ী সুখ ও প্রশান্তি নিশ্চিত হয় না। ইসলাম দ্বীনদারিতা, উত্তম চরিত্র, হালাল উপার্জন ও পারিবারিক দায়িত্ববোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথাযথ

অনুসন্ধান, পরামর্শ, ইস্তিখারা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা অপরিহার্য। সঠিক নির্বাচনই একটি কল্যাণময় পরিবার ও আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি।

বেঁটে, খাটো বলে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়নি যে মেয়েটি!

সোনালি দিনের একজন অচেনা সাহাবি। তার নাম ছিল জুলাইবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। জুলাইবিব নামের অর্থ ক্ষুদ্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত। আসলে তিনি ছিলেন বামন প্রকৃতির, এজন্যই এই নামে ডাকা হতো। তাঁর আরো একটি নাম ছিল "দামিম" যার অর্থ কুশী, বিকৃত, অথবা দেখতে বিরক্তিকর। তিনি যে সমাজে বাস করতেন সেখানে কেউ তার বংশ পরিচয় জানত না। এমনকি তিনি যে গোত্রের ছিলেন তাও সবার অজানা ছিল, আর তখনকার সময় এটা ছিল চরম অসম্মানের বিষয়। তিনি তার বিপদের সময় কারো কাছে সাহায্যও চাইতে পারত না, কারণ তখনকার সময় সাহায্য করা হতো মূলত গোত্রের মাধ্যমে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের শুরুর দিকের আনসার ছিলেন তিনি। যার একমাত্র পরিচয়ই ছিল তিনি একজন আরব। সেই সমাজে প্রায় সবাই তাঁকে নিয়ে হাসি, তামাসা, ঠাট্টা করতো। এমনকি আসলাম গোত্রের আবু বারজাহ নামক এক ব্যক্তি তাঁকে তার বাড়িতে প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলেন। কোনো মেয়ে তাঁকে বিয়ে করার কথা দূরের কথা তার কথা চিন্তাও করতে পারত না।

সুবহানাল্লাহ! কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার মর্যাদা ছিল অনেক উপরে। রহমতের নবি তাঁর কথা চিন্তা করে একদিন এক সাহাবির কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাই। সাহাবি খুশিতে বলে উঠলেন, ইয়া রাসুল! এ তো খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার মেয়েকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছি।

সাহাবি বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়ে খুবই হতাশ হয়ে বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে আপনাকে জানাচ্ছি। সাহাবি তার স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলার পর তার স্ত্রীও তার মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন শুরুতে। তারপর বললেন, জুলাইবিবের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে কখনোই না! আমরা তাঁকে জুলাইবিবের সাথে বিবাহ দেবো না!

আল্লাহর শপথ, এ হতেই পারে না। আনসার সাহাবি তাঁর স্ত্রীর মতামত নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তাঁদের মেয়ে দরজার আড়াল থেকে সব শুনছিলেন। সে বলল, তোমাদেরকে আমাকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দিতে বলছে কে? উত্তরে তার মা বলল-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন সে দেখল তার মা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন, সে বলল-আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও, তিনি নিশ্চয় আমার জন্য ধংস ডেকে আনবেন না।

আল্লাহ্ আকবার! ইসলামের সত্যিকার জ্ঞানের কারণে তাঁর হৃদয় ছিল বলমল, সে বুঝতে পেরেছিল, একজন মুসলিম হিসেবে তার কি করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا.

অতঃপর সে তার মা-বাবাকে কুরআনের এই আয়াতটা শুনালো-আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিনা নারীর সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট। (সূরা আহযাব:৩৬)

সে আরও বলতে থাকে, আমি খুশি মনেই নিজেকে নিবেদন করবো, যাতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য ভালো মনে করেন। আল্লাহর রাসুল মেয়েটির মতামত শুনে তার জন্য সহজ এবং সুন্দর জীবনের জন্য দুআ করলেন। এর মাঝে জিহাদের ডাক এসে যায়। জুলাইবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছুটে গেলেন জিহাদের ময়দানে। জিহাদ শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলাইবিবের খোঁজ নিতে বললেন। খুঁজে দেখা গেল সে একাই ৭জন কাফিরকে হত্যা করে নিজে শহিদ হয়ে গেছেন। বর্ণনায় আছে-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে (এরচেয়ে বরকতময় হাত আর কার হতে পারে?) তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন, অতঃপর তাঁর নিজের হাতে জুলাইবিবকে সমহিত করেছিলেন।

সুবহানাল্লাহ! জুলাইবিবের স্ত্রীর মর্যাদা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, অনেক বড় বড় সাহাবিরা তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন।

এটাই ইসলাম। এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব। জুলাইবিবের মত নাম গোত্রহীন যুবক ইসলামের কারণে পেয়েছিলেন অপার সম্মান। আর তার স্ত্রী পেয়েছিল রাসুলের কথা মান্য করার জন্য দুর্লভ সম্মান। আজ দীনদার তকমা লাগিয়ে ছেলে-মেয়েরা কতকিছু মিলিয়ে অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসে, আর দীনদারিতার সম্মানটা অবহেলায় পাশে পড়ে থাকে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

২.৬ অভিভাবকের(ওয়ালী) ভূমিকা

ইসলামে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় চুক্তি। এ চুক্তিকে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও কল্যাণকর করার জন্য শরীয়ত অভিভাবক বা ওয়ালীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছে। বিশেষত নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে ওয়ালীর উপস্থিতি, সম্মতি এবং তত্ত্বাবধানকে অধিকাংশ ইসলামি ফকীহ অপরিহার্য মনে করেন। এর উদ্দেশ্য হলো কন্যার কল্যাণ নিশ্চিত করা, প্রতারণা থেকে রক্ষা করা এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

ওয়ালীর সংজ্ঞা

ওয়ালী বলতে এমন নিকটাত্মীয় অভিভাবককে বোঝায়, যিনি শরীয়ত অনুযায়ী নারীর বিবাহ সম্পাদনে দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণত পিতা, পিতামহ, ভাই, চাচা প্রমুখ ক্রমানুসারে এ দায়িত্ব পালন করেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

“তোমরা মুশরিক নারীদেরকে মুশরিক পুরুষদের সঙ্গে বিবাহ দিও না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।” (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২২১)

এ আয়াতে “বিবাহ দিও না” বলে অভিভাবকদের সম্বোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, নারীর বিবাহে অভিভাবকের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “ওয়ালী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।” (সুনান আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

অন্য হাদিসে এসেছে:

“যে নারী তার ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল; তার বিবাহ বাতিল; তার বিবাহ বাতিল।”(সুনান আবু দাউদ, তিরমিযী)

এ হাদিসগুলো থেকে অধিকাংশ আলেম মত দেন যে, ওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না।

ওয়ালীর দায়িত্বসমূহ

১. পাত্রের দ্বীনদারিতা ও চরিত্র যাচাই করা।
২. হালাল উপার্জন ও দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা দেখা।
৩. কন্যার মতামত ও সম্মতি নিশ্চিত করা।
৪. কন্যার কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।
৫. বিবাহ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বিচক্ষণতা অবলম্বন করা।

ইসলাম যেমন ওয়ালীর অনুমতিকে গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি পাত্রীর সম্মতিকেও অপরিহার্য করেছে। কোনো নারীর সম্মতি ছাড়া তাকে বিবাহ দেওয়া বৈধ নয়।

কখনো অভিভাবক ব্যক্তিগত স্বার্থ, অহংকার বা সামাজিক কারণে উপযুক্ত পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে তিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী বলে গণ্য হন। তখন পরবর্তী যোগ্য অভিভাবক অথবা ইসলামি বিচারক (কাজী) ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

“যার কোনো ওয়ালী নেই, শাসক (বা বিচারক) তার ওয়ালী।”
— সুনান তিরমিযী

উকীল বাবা ও কনের কাছ থেকে ইয়ন নেওয়ার শরয়ী বিধান

বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে কনের কাছ থেকে বিবাহের সম্মতি (ইয়ন) নেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যাকে “উকীল বাবা” বলা হয়। অনেক সময় এমন কাউকে উকীল নিযুক্ত করা হয় যে কনের কোনো মাহরাম নন। তিনি কনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বিবাহের মজলিসে কনের পক্ষ থেকে ওকালতি করেন।

প্রয়োজনে কনে কাউকে উকীল হিসেবে নিযুক্ত করতে পারে। তবে পিতা, ভাই বা অন্য মাহরাম উপস্থিত থাকলে অপ্রয়োজনে গায়রে মাহরাম ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব দেওয়া অনুচিত। কারণ সামাজিকভাবে “উকীল বাবা” বলা হলেও তিনি কখনো মাহরাম হয়ে যান না। তার সঙ্গে পর্দার বিধান আগের মতোই বহাল থাকে।

অনেকের ধারণা, কনের কাছ থেকে ইযন নেওয়ার সময় দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি আবশ্যিক। কিন্তু শরীয়ত অনুযায়ী এটি বাধ্যতামূলক নয়। কনের সম্মতি নিশ্চিত হওয়াই মূল বিষয়। সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি হয় নিকাহর মূল আকদের সময়; কনের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নেওয়ার সময় নয়।

অতএব, “উকীল বাবা”কে মাহরামের মর্যাদা দেওয়া, তার সঙ্গে পর্দা না মানা এবং ইযন নেওয়ার সময় সাক্ষী থাকা বাধ্যতামূলক মনে করা—এসব ভিত্তিহীন সামাজিক প্রথা পরিহার করা উচিত।

আধুনিক সমাজে ওয়ালীর গুরুত্ব

বর্তমান সমাজে আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত, যাচাই ছাড়া সম্পর্ক এবং পারিবারিক মতামত উপেক্ষা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে প্রতারণা, পারিবারিক অশান্তি ও বিচ্ছেদের হার বাড়ছে। একজন দায়িত্বশীল ওয়ালী অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে সন্তানের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২.৭ মোহরানা

মোহরানা (মাহর) হলো বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অর্থ বা সম্পদ, যা স্ত্রীর সম্মান ও আর্থিক অধিকারের প্রতীক। এটি কোনো অনুগ্রহ বা উপহার নয়; বরং শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্ত্রীর স্বতন্ত্র সম্পত্তি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: **وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً**

“আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান কর।” — সূরা আন-নিসা, ৪:৪

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মোহর প্রদান করা স্বামীর উপর আবশ্যিক এবং স্ত্রী তার পূর্ণ মালিক।

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ

ইসলামে মোহরের সর্বোচ্চ কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম রৌপ্য, যা প্রায় ৩০.৬১৮ গ্রাম রূপার সমপরিমাণ।

এর চেয়ে কম পরিমাণে মোহর নির্ধারণ করা হানাফী ফকীহদের মতে বৈধ নয়। তবে এ ন্যূনতম পরিমাণকে আদর্শ বলা হয়নি; বরং এটি আর্থিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত একটি সর্বনিম্ন সীমা। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য সম্মানজনক ও বাস্তবসম্মত পরিমাণে মোহর নির্ধারণ করাই উত্তম।

মোহরের প্রকারভেদ

মোহরানার আলোচনায় সাধারণত দুই ধরনের মোহরের কথা উল্লেখ করা হয়। আরবি পরিভাষা হওয়ায় অনেকেই এ শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন না। মূলত মোহর দুই প্রকার:

- **مهر معجل** (মোহরে মুআজ্জাল) — তাৎক্ষণিক বা নগদ পরিশোধযোগ্য মোহর।
- **مهر مؤجل** (মোহরে মুআজ্জাল) — বিলম্বিত বা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধযোগ্য মোহর।

১. মোহরে মুআজ্জাল

মোহরে মুআজ্জাল বলতে সেই মোহরকে বোঝায়, যা বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর উপর আদায় করা আবশ্যিক হয়ে যায়। স্বামী চাইলে তা অবিলম্বে পরিশোধ করতে পারেন, অথবা স্ত্রী দাবি করলে তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

স্ত্রীর এ মোহর যেকোনো সময় দাবি করার পূর্ণ শরয়ি অধিকার রয়েছে। যদিও আমাদের সমাজে অনেক নারী তা দাবি করেন না, তবুও এতে স্বামীর দায়িত্ব হ্রাস পায় না। বরং যথাসম্ভব দ্রুত এ মোহর পরিশোধ করে দেওয়া উত্তম।

২. মোহরে মুআজ্জাল

মোহরে মুআজ্জাল হলো সেই মোহর, যার পরিশোধের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষ ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট সময় বা শর্ত নির্ধারণ করে নেন। নির্ধারিত সময় আসার আগে স্বামীর ওপর তা পরিশোধ করা আবশ্যিক হয় না এবং স্ত্রীও তা দাবি করার অধিকার রাখেন না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি নির্ধারণ করা হয় যে পাঁচ বছর পর অথবা কোনো নির্দিষ্ট তারিখে মোহর পরিশোধ করা হবে, তবে সেই সময় আসার পর তা আদায় করা আবশ্যিক হবে।

আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না করেই মোহরের একটি অংশকে “মুআজ্জাল” বলা হয়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধারণত তালাক অথবা স্বামী-স্ত্রীর কারো মৃত্যুর পর এ মোহর পরিশোধ করা হবে।

মোহরে ফাতেমী

মোহরে ফাতেমী বলতে সেই পরিমাণ মোহরকে বোঝায়, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহে নির্ধারণ করেছিলেন। এর পরিমাণ ছিল ৫০০ দিরহাম রৌপ্য, যা প্রায় ১৩১.২৫ তোলা বা আনুমানিক ১৫৩০.৯ গ্রাম রূপার সমপরিমাণ।

অনেক আলেমের মতে, এটি মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য একটি উত্তম ও সুন্নাহসম্মত মানদণ্ড। তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়; সামর্থ্য অনুযায়ী এর কম বা বেশি মোহর নির্ধারণ করা বৈধ।

মোহরানার বিধান

- মোহর স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ; এতে অন্য কারও অধিকার নেই।
- স্ত্রী স্বেচ্ছায় চাইলে এর কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ ক্ষমা করতে পারেন।
- তালাকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য আবশ্যিক।
- স্বামীর মৃত্যুর পর মোহর তার দেনা হিসেবে গণ্য হবে এবং উত্তরাধিকার বণ্টনের আগে তা পরিশোধ করতে হবে।

মোহর নিয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা

আমাদের সমাজে অনেক সময় মোহর কেবল কাগজে-কলমে নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু বাস্তবে তা পরিশোধের ইচ্ছা থাকে না। আবার সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত মোহর ধার্য করা হয়, যা বাস্তবসম্মত নয়। উভয় প্রবণতাই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

মোহরানা ইসলামে স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অধিকার। এটি নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তাই মোহর নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা, সামর্থ্য

এবং শরীয়তের নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিত। যথাযথভাবে মোহর আদায় করলে দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্ববোধ ও বরকত বৃদ্ধি পায়।

২.৮ বিবাহের অনুষ্ঠান ও ওলীমা

বিবাহের অনুষ্ঠান

বিবাহ ইসলামে একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতস্বরূপ সামাজিক বন্ধন। তাই এ উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা বৈধ এবং শরীয়তসম্মত সীমার মধ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন করাও জায়েয। তবে এ আনন্দ উদযাপন অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও শালীনতার সীমারেখার মধ্যে হতে হবে। বর্তমানে অনেক সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অপচয়, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা, গান-বাজনা এবং বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রচলন দেখা যায়, যা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী।

ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

- অনুষ্ঠান হবে সরল, পরিমিত ও অহেতুক জাঁকজমকমুক্ত।
- নারী-পুরুষের পর্দা ও শালীনতা বজায় থাকবে।
- গান-বাজনা, নৃত্য ও শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অপচয় ও লোকদেখানো প্রতিযোগিতা পরিহার করতে হবে।
- আত্মীয়-স্বজন ও গরিবদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিবাহে প্রচলিত কিছু অনৈসলামিক রীতি

আমাদের সমাজে বিবাহ উপলক্ষে কিছু রীতি প্রচলিত আছে, যা ইসলামী দৃষ্টিতে পরিহারযোগ্য। যেমন—

- অতিরিক্ত সাজসজ্জা ও অপচয়।
- গান-বাজনা ও নৃত্যানুষ্ঠান।
- গায়ে হলুদে অশালীনতা ও কুসংস্কার।
- যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ।
- ছবি ও ভিডিও ধারণে পর্দার লঙ্ঘন।
- ঋণ করে অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করা।

সরল বিবাহের ফজিলত

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

“সর্বাধিক বরকতময় বিবাহ হলো যে বিবাহে ব্যয় কম হয়।”

— মুসনাদ আহমদ (অর্থগতভাবে)

এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, বিবাহ যত সহজ ও পরিমিত হবে, তাতে বরকত তত বেশি হবে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে করণীয়

- বিবাহকে সহজ করা।
- শরীয়তসম্মতভাবে আকদ সম্পন্ন করা।
- ওলীমার আয়োজন করা।
- নবদম্পতির জন্য দোয়া করা।
- অপচয় ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।

ওলীমা

ওলীমা হলো বিবাহ-পরবর্তী ভোজ, যা স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে আয়োজন করে। ইসলামে ওলীমা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এর মাধ্যমে বিবাহের ঘোষণা দেওয়া, আনন্দ প্রকাশ করা এবং সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হয়।

عَنْ أَنَسٍ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ لَا رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ۖ

অর্থ: "আনাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) আবদুর রহমান বিন আউফ এর গায়ে হলুদের রং দেখতে পেলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন- এটা কি? সে বলল, আমি এক মেয়েকে এক টুকরো স্বর্ণ মোহরানা ধার্য করে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার কাজে বরকত দিন, একটি বকরীর মাধ্যমে হলেও ওলীমা কর।” (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ওলীমা করা সুন্নাত; তবে তা সামর্থ্যের মধ্যে হওয়া উচিত। ইসলাম অপচয় ও অহেতুক জাঁকজমককে উৎসাহিত করে না।

ওলীমার উদ্দেশ্য

ওলীমার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

- বিবাহের ঘোষণা প্রদান করা।
- আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।
- আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করা।
- পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা।

ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নাত এবং অধিকাংশ আলেমের মতে বিশেষ ওজর না থাকলে তা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

“তোমাদের কাউকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যেন তা গ্রহণ করে।”— সহীহ মুসলিম

অন্য হাদিসে এসেছে:

“যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল।”— সহীহ মুসলিম

তবে যদি দাওয়াতের অনুষ্ঠানে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড, যেমন গান-বাজনা, অশ্লীলতা বা পর্দাহীনতার ব্যবস্থা থাকে এবং তা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেখানে উপস্থিত না হওয়াই উত্তম।

অধ্যায়-৩:পারিবারিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব

৩.১ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব

ইসলামে বিবাহ কেবল একটি সামাজিক চুক্তি নয়; বরং এটি পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র বন্ধন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অপরের প্রতি নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। এ অধিকারসমূহ যথাযথভাবে পালন করা হলে পরিবারে শান্তি, সৌহার্দ্য ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“নারীদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তেমন অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের ওপর দায়িত্ব রয়েছে।”

— সূরা আল-বাকারা, ২:২২৮

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

ইসলাম স্বামীর উপর স্ত্রীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার নির্ধারণ করেছে। যেমন—

1. নির্ধারিত মোহর যথাযথভাবে পরিশোধ করা।
2. ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা।
3. নিরাপদ ও উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
4. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার করা।
5. স্ত্রীর সম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
6. দ্বীন পালনের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তমভাবে জীবনযাপন কর।”

— সূরা আন-নিসা, ৪:১৯

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

স্ত্রীর ওপর স্বামীরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রয়েছে। যেমন—

1. বৈধ বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা।
2. স্বামীর মান-সম্মান ও সম্পদের হেফাজত করা।
3. দাম্পত্য বিশ্বস্ততা বজায় রাখা।
4. সংসার পরিচালনায় সহযোগিতা করা।
5. সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালনে অংশগ্রহণ করা।

পারস্পরিক দায়িত্ব

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব হলো—

- পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।
- একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করা।
- মতবিরোধ হলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা।
- সন্তানদের দ্বীনী ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলা।
- পরিবারে ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম।”

— সুনান তিরমিযী

৩.২ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি: ভালোবাসা, দয়া ও বন্ধুত্ব

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রভু ও ভূত্যের সম্পর্ক নয়; বরং এটি ভালোবাসা, দয়া ও আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”

— সূরা আর-রুম, ৩০:২১

আশরাফ আলী থানভী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, যদিও স্বামী পরিবারে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন, তবুও স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে আন্তরিকতা, সম্মান ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের ভিত্তিতে। নেতৃত্বের উদ্দেশ্য কর্তৃত্ব প্রদর্শন নয়; বরং পারিবারিক জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা।

অতএব, একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহচর ও কল্যাণকামী। এ ধরনের সম্পর্ক পরিবারে শান্তি, স্থিতি ও বরকত বয়ে আনে।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব ইসলামী পারিবারিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি। উভয়েই যদি আন্তরিকতার সঙ্গে পরস্পরের অধিকার আদায় করে এবং দায়িত্ব পালন করে, তবে পরিবারে ভালোবাসা, শান্তি ও বরকত প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের জন্য এসব নির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ অপরিহার্য।

৩.৩ সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব

ইসলামে সন্তানকে আল্লাহ তা‘আলার এক মহান নিয়ামত এবং পিতা-মাতার জন্য একটি আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সন্তান কেবল পারিবারিক উত্তরাধিকার নয়; বরং ভবিষ্যৎ সমাজ ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাই তাদেরকে সুশিক্ষা, নৈতিকতা ও দ্বীনদারিতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।”

— সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া পিতা-মাতার মৌলিক দায়িত্ব।

পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্বসমূহ

- সন্তানের জন্য সুন্দর ও অর্থবহ নাম নির্বাচন করা।
- হালাল উপার্জনের মাধ্যমে ভরণপোষণ নিশ্চিত করা।
- কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা।

- সালাত, সিয়াম ও ইসলামী আদর্শে অভ্যস্ত করে তোলা
- উত্তম চরিত্র, শিষ্টাচার ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া।
- সৎ সঙ্গ ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- মানসিক স্নেহ, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা প্রদান করা।
- উপযুক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বয়ঃপ্রাপ্ত হলে উপযুক্ত সময়ে বিবাহের ব্যবস্থা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”— (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আরেক হাদিসে এসেছে:

“কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্রের চেয়ে উত্তম উপহার দিতে পারে না।”— (সুনান তিরমিযী)

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অপব্যবহার, নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতার বিস্তার এবং পিতা-মাতার ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক পরিবারে জাগতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হলেও দ্বীনী শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে। ফলে সন্তানরা মূল্যবোধের সংকটে পড়ে।

সন্তান লালন-পালন কেবল খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদেরকে আল্লাহভীরু, সৎ ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই পিতা-মাতার প্রকৃত দায়িত্ব। পিতা-মাতা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেন, তবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

অধ্যায়-৪:বিচ্ছেদ ও পরবর্তী বিধান

৪.১ তালাক

ইসলামে তালাক একটি বৈধ কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করার প্রতি ইসলামের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীসে তালাককে সীমিত করা হয়েছে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তালাকের আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও উত্তম আচরণের নির্দেশ কোরআন এ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(সূরা আন-নিসা: ১৯)

অর্থ: “তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর, তবে হতে পারে তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।”

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, সাময়িক অপছন্দ বা সমস্যা থাকলেও ধৈর্য ধারণ করে সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত।

কুরআন আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা দ্রুত বিচ্ছেদের দিকে না নিয়ে গিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
(সূরা আন-নিসা: ৩৫)

অর্থ: “যদি তারা উভয়ে সংশোধনের ইচ্ছা করে, তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল করে দেবেন।”

এ আয়াত অনুযায়ী, সমস্যার ক্ষেত্রে সালিশ (মীমাংসা কমিটি) গঠন করা ইসলামী পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তালাক প্রদানের শরঈ পদ্ধতি

যদি সব ধরনের সমাধান ব্যর্থ হয়, তবে ইসলামে তালাক প্রদানের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে:

- স্ত্রীকে এমন পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে, যাতে মাসিক চলমান না থাকে
 - ঐ পবিত্র অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন না হয়ে থাকতে হবে
 - হায়েয (মাসিক) অবস্থায় তালাক দেওয়া শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ
 - একসাথে একাধিক তালাক না দিয়ে এক তালাক প্রদান করা উত্তম
- এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো তাৎক্ষণিক আবেগের কারণে নেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করা।

তালাক প্রদানের পর শরঈ বিধান

এক তালাক দেওয়ার পর:

- এটি সাধারণত তালাক-এ-রজঈ হয়
- ইদত চলাকালীন স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে সেক্ষেত্রে পুনরায় নিকাহ এর প্রয়োজন নেই
- যদি ইদত শেষ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় নতুন নিকাহের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

এভাবে ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের সুযোগ রেখেছে।

যদি পুনরায় দাম্পত্য জীবনে বিরোধ সৃষ্টি হয়:

- আবারও এক তালাক দেওয়া যাবে সেক্ষেত্রে মোট দুই তালাক হয়ে যাবে
- মোট দুই তালাক পর্যন্ত সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের সুযোগ থাকে
- তৃতীয় তালাক হলে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়

তৃতীয় তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আর বৈধ থাকে না, যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য বৈধ বিবাহ ও বিচ্ছেদ সম্পন্ন করেন।

তিন তালাকের পরবর্তী শরঈ বিধান

ইসলামী শরীয়তে তিন তালাক হলো বিবাহ বিচ্ছেদের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়। একবার তিন তালাক সংঘটিত হলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে নির্দিষ্ট শরঈ শর্ত পালন করা আবশ্যিক।

তিন তালাকের পর পুনর্বিবাহের বিধান

তিন তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে স্বামীর জন্য পুনরায় হালাল হওয়ার একমাত্র শরঈ পদ্ধতি হলো:

- স্ত্রী ইদত পালন শেষে অন্য একজন পুরুষের সাথে বৈধভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে
- দ্বিতীয় বিবাহ পূর্ণাঙ্গ দাম্পত্য জীবন হিসেবে হতে হবে
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক মিলন (সহবাস) সংঘটিত হতে হবে
- এরপর যদি দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দেয় বা স্বামী মৃত্যুবরণ করে

তাহলে ইদত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে নতুন নিকাহ করা বৈধ হবে তবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধুমাত্র প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে শর্তসাপেক্ষ বিবাহ (যাকে “হালালা” উদ্দেশ্য করা হয়) ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও অভিশপ্ত কাজ হিসেবে গণ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের শর্ত আরোপকারী ও যার জন্য শর্ত করা হয় উভয়ের উপর লানত করেছেন (সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারেমী)।

সহবাস ব্যতীত দ্বিতীয় বিবাহের বিধান

শরীয়তের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিবাহে শুধুমাত্র নিকাহ যথেষ্ট নয়। পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো:

- দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বাস্তব দাম্পত্য জীবন
- এবং সহবাস সংঘটিত হওয়া

যদি সহবাসের পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী পুনরায় হালাল হবে না। এ বিষয়ে হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত একটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে— এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা:)এর কাছে এসে পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে নবী (সা:)বলেন, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না (সহীহ বুখারী)।

তালাক অস্বীকার করা সম্পর্কিত বিধান

শরীয়তের বিধান অমান্য করে সমাজে লজ্জা বা পারিবারিক সমস্যা এড়ানোর জন্য কেউ যদি প্রদত্ত তালাক অস্বীকার করে, তবে তা মারাত্মক গুনাহের কাজ।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ তিন তালাক প্রদান করেও পরবর্তীতে সমাজে বলে যে এক বা দুই তালাক দিয়েছে, এবং পূর্বের দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যায়। এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে:

- মিথ্যা ও প্রতারণা
- হারাম সম্পর্ক বজায় রাখা
- এবং গুরুতর গুনাহে লিপ্ত হওয়া

এভাবে ব্যক্তি নিজের আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে।

ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত তালাকের বিধান

ইসলামী শরীয়তে তালাক সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছার পার্থক্য সাধারণভাবে বিবেচ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন:

“তিনটি বিষয় এমন, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা এবং মজা করে বলা একই রকম: বিবাহ, তালাক এবং রাজ‘আত (তালাক প্রত্যাহার)।”

এই হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে:

- কেউ হাসি-তামাশা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে
- অনুরূপভাবে বিবাহ ও রাজ‘আতও একইভাবে কার্যকর হয়

অতএব, এসব বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক।

শরঈ পদ্ধতির গুরুত্ব ও কল্যাণ

ইসলামী তালাক পদ্ধতিতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যেমন:

- আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা পাওয়া
- পুনর্মিলনের সুযোগ থাকা
- পরিবার ভাঙন কমানো
- ধৈর্য ও চিন্তাভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করা

এ পদ্ধতি দাম্পত্য সম্পর্ককে সহজে ভাঙতে না দিয়ে সংরক্ষণে উৎসাহিত করে।

সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা

বর্তমান সমাজে একটি মারাত্মক ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে:

- এক বা দুই তালাককে “আসল তালাক” হিসেবে গণ্য করা হয় না
- ফলে অনেকেই হঠাৎ করে তিন তালাক দিয়ে বসে

অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এক তালাকই যথেষ্ট এবং উত্তম পদ্ধতি। একসাথে তিন তালাক দেওয়া কঠিন গুনাহ এবং পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সুযোগ নষ্ট করে দেয়।

চারটি মাযহাব (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী) এ বিষয়ে একমত যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তসম্মত পদ্ধতি নয়।

কুরআন ও হাদীস তালাককে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে তালাক একটি নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যা পরিবার ও সমাজ উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে।

৪.২ খুলা তালাক (স্ত্রীর বিচ্ছেদের অধিকার)

ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থায় যেমন স্বামীকে তালাক প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্ত্রীকেও বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বৈধ অধিকার দেওয়া হয়েছে, যাকে “খুলা” বলা হয়। এটি ইসলামের একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা, যা দাম্পত্য জীবনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে শান্তিপূর্ণভাবে বিচ্ছেদের সুযোগ প্রদান করে।

খুলা হলো এমন একটি বৈবাহিক বিচ্ছেদ, যেখানে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কিছু বিনিময় প্রদান করে (যেমন মোহরানা ফেরত দেওয়া) স্বামীর সম্মতিতে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে।

অর্থাৎ, খুলা মূলত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যেখানে স্ত্রী মুক্তির জন্য আর্থিক বা নির্দিষ্ট শর্তে স্বামীকে রাজি করায়।

খুলার বৈধতা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

فَإِذَا جُنَّاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (সূরা আল-বাকার: ২২৯)

অর্থ: “স্ত্রী যদি কিছু মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে, তবে তাতে কোনো গুনাহ নেই।”

এছাড়া হাদীসে সাবেত ইবনে কায়েস (রা.)-এর স্ত্রীর ঘটনা থেকে খুলার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন যে, তিনি স্বামীর দ্বীনদারী ও চরিত্রে কোনো দোষ দেখেন না, কিন্তু তিনি তার সাথে দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যেতে অক্ষম। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কি স্বামীর দেওয়া বাগান (মোহর) ফেরত দিতে প্রস্তুত? তিনি সম্মত হলে নবী ﷺ খুলার ব্যবস্থা করেন।

(সহীহ বুখারী)

খুলার শরঈ বিধান ও পদ্ধতি

যদি দাম্পত্য জীবন অচল হয়ে পড়ে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব না হয়, তাহলে:

- স্ত্রী স্বামীর নিকট খুলার প্রস্তাব দিতে পারে
- সাধারণত মোহরানা বা তার সমমূল্য ফেরত দেওয়া হয়
- স্বামী রাজি হলে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হয়
- আদালত বা শরঈ বিচারকের মাধ্যমেও খুলা সম্পন্ন হতে পারে

ফুকাহায়ে কেরামের মতে, খুলা একটি বৈধ চুক্তি, তবে এর বিনিময় যেন অতিরিক্ত না হয়—এটাই উত্তম।

শরীয়তের দৃষ্টিতে খুলার মাধ্যমে:

- একটি তালাক-এ-বায়িন সংঘটিত হয়
- ইদত পালন শেষে স্ত্রী স্বাধীনভাবে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে
- পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে নতুন নিকাহ আবশ্যিক হয়

তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ভবিষ্যতে পুনরায় বিবাহ সম্ভব।

খুলার ক্ষেত্রে বিনিময়ের বিধান

- যদি স্বামীর অন্যায় বা জুলুমের কারণে খুলা হয়, তাহলে তার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অনুচিত
- যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে অনিচ্ছা বা অসামঞ্জস্যের কারণে হয়, তবে বিনিময় গ্রহণ বৈধ

- তবে উত্তম হলো মোহরানার সমপরিমাণ বা তার কম গ্রহণ করা

যদি স্বামী-স্ত্রী নিজেরা সমাধানে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে:

- স্ত্রী ইসলামী বিচারকের নিকট যেতে পারে
- বিচারক শরঈভাবে খুলার ব্যবস্থা করতে পারে
- ইসলামী আদালত না থাকলে আলেমদের জামায়াত বা দ্বীনদার মুসলমানদের মাধ্যমে সালিশি গ্রহণযোগ্য

তবে কুফরী বা অইসলামী আদালতের সিদ্ধান্ত শরঈভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেক ফিকহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

খুলার পর স্ত্রীকে ইদত পালন করতে হয়, ইদত শেষ হলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহে স্বাধীন হয়।

খুলা ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায়সংগত ব্যবস্থা, যা নারীর অধিকার সংরক্ষণ করে এবং দাম্পত্য জীবনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে শান্তিপূর্ণ বিচ্ছেদের সুযোগ দেয়। তবে এটি হালকা বা আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নয়; বরং প্রয়োজন ও শরঈ শর্ত পূরণের পরই গ্রহণযোগ্য।

৪.৩ ইদত

ইদত হলো বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট সময়, যে সময় পর্যন্ত একজন নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারেন না। ইসলামী শরীয়তে ইদতের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা, পারিবারিক মর্যাদা সংরক্ষণ এবং সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

“তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ঋতুমতী হওয়া থেকে নিরাশ হয়েছে, তাদের ইদত তিন মাস। আর যাদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদেরও তাই। আর গর্ভবতী

নারীদের ইদত সন্তান প্রসব পর্যন্ত।”

— সূরা আত-তালাক, ৬৫:৪

ইদতের প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়তে পরিস্থিতিভেদে ইদতের সময়কাল ভিন্ন হয়ে থাকে।

১. তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদত

যেসব নারীর সাথে সহবাস হয়েছে এবং তারা গর্ভবতী নন, তাদের ইদত হলো তিন হায়েয (মাসিক) বা তিন পবিত্রতা।

২. কম বয়সী বা বৃদ্ধ নারীর ইদত

যাদের বয়স কম হওয়ার কারণে মাসিক শুরু হয়নি অথবা বয়সের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদত তিন মাস।

৩. গর্ভবতী নারীর ইদত

গর্ভবতী নারীর ইদত সন্তান জন্মদান পর্যন্ত, চাই তা তালাকের কিছুদিন পরেই হোক অথবা দীর্ঘ সময় পরে।

৪. বিধবা নারীর ইদত

স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর ইদত চার মাস দশ দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

“স্বামীর মৃত্যুর পর নারী চার মাস দশ দিন ইদত পালন করবে।”

— সহীহ মুসলিম

৫. খোলা তালাকের ইদত

খোলা তালাক গ্রহণকারী নারীর ইদত এক হায়েয বা এক মাস।

৬. সহবাসের পূর্বে তালাক

যেসব স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি, তাদের জন্য কোনো ইদত নেই।

ইদতকালীন বিধান

১. ইদত চলাকালে নারী অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।
২. রাজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী ইদত চলাকালে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে।
৩. রাজয়ী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়।
৪. বিধবা নারী সাধারণত স্বামীর ঘরেই ইদত পালন করবে।
৫. প্রয়োজন হলে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া জায়েয, তবে রাত যাপন নিজ ঘরেই

করা

উত্তম।

৬. ইদতকালে অযথা সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে বাস কর, তাদেরকেও সেখানে বাস করতে দাও।”

— সূরা আত-তালাক, ৬৫:৬

ইদত ইসলামী পারিবারিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এর মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্ক, বংশের বিশুদ্ধতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষিত হয়। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত ইদতের বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং তা যথাযথভাবে পালন করা।

৪.৪ উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার বা মীরাস হলো মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করার বিধান। ইসলামে উত্তরাধিকার আইন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত। এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত হয় এবং সম্পদ বণ্টনে অন্যায়, বৈষম্য ও বিরোধের অবসান ঘটে।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজিদে বলেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

“পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয় যা কিছু রেখে যায়, তাতে পুরুষদের জন্যও অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে।”

— সূরা আন-নিসা, ৪:৭

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করেছে; যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক ব্যবস্থা।

মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পন্ন করতে হয়—

১. দাফন-কাফনের প্রয়োজনীয় খরচ পরিশোধ।

2. মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ।
3. বৈধ ওসিয়ত (সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন।
4. অবশিষ্ট সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন।

ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত—পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা, ভাই-বোন, অন্যান্য নিকটাত্মীয়।

নারী ও পুরুষের অংশ

পুরুষের অংশ নারীর তুলনায় দ্বিগুণ হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।”

— সূরা আন-নিসা, ৪:১১

এর কারণ হলো, ইসলামে পুরুষের উপর পরিবার পরিচালনা, মোহর, ভরণপোষণ ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে; পক্ষান্তরে নারীর সম্পদ তার নিজস্ব অধিকার হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। নারীর ভরণপোষণ এর দায়িত্ব তার নিজে বহন করতে হয় না বরং নারীর দায়িত্ব বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে এমন মাহরাম দের পালন করতে হয়। তাই নারীর যে নিজস্ব সম্পদ তা তার বাড়তি সম্পদ হিসেবেই থেকে যায়। সুতরাং এটা কোনোভাবেই বলা যায় না যে ইসলাম নারীদের বঞ্চিত রেখেছে। ইসলাম তো নারীদের সম্মানিত রাখে।

উত্তরাধিকার আইনের গুরুত্ব

1. আল্লাহ নির্ধারিত বিধান হওয়ায় এটি পালন করা ফরজ।
2. পারিবারিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব কমায়।
3. নারী ও দুর্বল সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করে।
4. সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করে।

অনেক সমাজে কন্যা, স্ত্রী বা মায়ের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়, যা মারাত্মক অন্যায় ও গুনাহ। ইসলামে কারও প্রাপ্য উত্তরাধিকার আত্মসাৎ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারিত একটি পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা। এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল উত্তরাধিকারীর অধিকার সুরক্ষিত থাকে। তাই মুসলিম সমাজের প্রত্যেকের উচিত এ বিধান সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

অধ্যায়-৫ আধুনিক সমাজে পারিবারিক জীবনের চ্যালেঞ্জ

৫.১ বাল্যবিবাহ

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মেয়ের বয়স ১৮ ও ছেলের বয়স ২২ হলো বিবাহের বয়স। এর আগে বিবাহ হলে সেটা বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। নাস্তিক, নারীবাদী পতিতাদের প্রভু আমেরিকা-ইউরোপ ওপেন সেক্স এর দেশ। তাদের বিবাহের আইন ১৪-১৬ হলে বাংলাদেশের ১৮ বছর কেন? বাংলাদেশে প্রতিদিন যিনার কারণে কয়েক ডজন নবজাতক এর স্থান হয় ডাস্টবিন, নদী নালায়। আরো কতক তো পৃথিবীর আলো দেখার আগেই ভ্রূণ অবস্থায় হত্যার শিকার হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ১৪ বছরের পর কোন ছেলে বা মেয়ে ফিজিক্যাল রিলেশন (যিনা) এ জড়ানোর ব্যাপারে স্বাধীন। অর্থাৎ তারা চাইলে একসাথে থাকতে পারে বিবাহ ছাড়াই যাকে তারা বলে লিভ টুগেদার বা লিভ ইন এ আছি। আমাদের কাছে একটা পরিচিত স্লোগান হলো : ‘বাল্যবিবাহ কে না বলুন’। অথচ স্লোগান হওয়া উচিত ছিল বাল্যবিবাহকে নয় বাল্যযিনাকে না বলুন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর দিকে তাকালেই বুঝা যায় কিভাবে একটা বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে যিনাতে জড়াচ্ছে প্রেম ভালোবাসার নামে। ফলে শত শত মেয়ের জীবন ধ্বংস হচ্ছে, কোন কিছু বুঝার আগেই তারা গর্ভধারণ করে তাই দিশেহারা হয়ে হয় ভ্রূণ অবস্থায় ই গর্ভপাত করে নয় বাচ্চার জন্মের পর বাচ্চাকে ফেলে দেয় বা হত্যা করে, অনেকে আবার এই বদনাম নিয়ে বাচতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

অথচ ইসলামে বিবাহ কে কত সহজ করা হয়েছে। জীবনে ইসলামের প্রয়োগ থাকলে এসব অনৈতিক কাজ বা আত্মহত্যার পথ এর প্রয়োজন পড়ত না। সম্মানের সহীত নিজের স্ত্রী বা স্বামী র সাথে প্রেম ভালোবাসা ও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবে।

ইসলাম একদিকে অশ্লীলতা, প্রেমের নামে অবৈধ সম্পর্ক এবং যিনাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে; অন্যদিকে বিবাহকে সহজ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

এবং ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা।

(বনী ইসরাঈল ১৭:৩২)

রাসূলুল্লাহ (সা) যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন:

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে।”

— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

৫.২ হারাম সম্পর্ক ও অবাধ মেলামেশা

বর্তমান সমাজে পারিবারিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো হারাম সম্পর্ক ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের দুর্বলতার কারণে এ সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রেমের নামে অনিয়ন্ত্রিত সম্পর্ক, অনলাইন যোগাযোগ, অশ্লীলতা এবং একান্ত সাক্ষাৎ অনেক সময় যিনা ও অন্যান্য গুরুতর গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্কে একটি সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। বৈধ সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম হলো বিবাহ। বিবাহের বাইরে আবেগঘন সম্পর্ক, প্রেমালাপ ও অনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ইসলামে নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

“কোনো পুরুষ যখন কোনো পরনারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করে, তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান।” — সুনান তিরমিযী

হারাম সম্পর্ক ও অবাধ মেলামেশার ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন—

- ঈমান ও তাকওয়ার দুর্বলতা।

- যিনা ও অন্যান্য বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা।
- পড়াশোনা ও কর্মজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগ ও হতাশা।
- পারিবারিক বিরোধ ও অবিশ্বাস।
- বৈবাহিক জীবনে অশান্তি ও তালাকের ঝুঁকি বৃদ্ধি।

হারাম সম্পর্ক ও অবাধ মেলামেশা আধুনিক সমাজে পারিবারিক অস্থিরতার অন্যতম বড় কারণ। ইসলাম এ ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে এবং বিবাহকে বৈধ ও মর্যাদাপূর্ণ পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এ অনৈতিক প্রবণতা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

৫.৩ পরকীয়া

পরকীয়া বলতে বিবাহিত ব্যক্তি তার বৈধ দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে অন্য কোনো নারী বা পুরুষের সঙ্গে প্রেম, আবেগঘন সম্পর্ক বা শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোকে বোঝায়। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ এবং পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি।

ইসলাম বিবাহকে পবিত্র অঙ্গীকার হিসেবে গণ্য করেছে এবং স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে অন্য কারও প্রতি আকর্ষণ, গোপন সম্পর্ক বা অনৈতিক আচরণ দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

আজকাল তো পরকীয়া এতো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে প্রতিদিনই ফেসবুক ইন্টারনেট খুললেই দেখা যায় পরকীয়ার নিউজ।

পরকীয়ার কারণ

1. দাম্পত্য সম্পর্কে দূরত্ব ও যোগাযোগের অভাব।
2. ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরে যাওয়া।
3. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার।
4. অশ্লীলতা ও অনৈতিক বিনোদনের প্রভাব।

5. পারস্পরিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা।

পরকীয়ার ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে বহুমুখী ক্ষতি হয়। যেমন—

- স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়।
- সংসারে অশান্তি ও কলহ বৃদ্ধি পায়।
- তালাক ও পরিবার ভাঙনের আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- সন্তানের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
- সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।
- আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গুনাহের কারণ হয়।

পরকীয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- নিয়মিত খোলামেলা আলোচনা ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা।
- দৃষ্টি সংযত রাখা ও পর্দার বিধান মেনে চলা।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা।
- আল্লাহভীতি ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

পরকীয়া ব্যক্তি ও পরিবার উভয়ের জন্যই ধ্বংসাত্মক। এটি দাম্পত্য জীবনের আস্থা, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেয়। ইসলাম বৈবাহিক সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষা এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শিক্ষা দেয়। তাই একটি সুখী ও নিরাপদ পরিবার গঠনের জন্য পরকীয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা আবশ্যিক।

৫.৪ ক্যারিয়ার ও বিয়ের দ্বন্দ্ব

আধুনিক সমাজে ক্যারিয়ার ও বিয়েকে অনেক সময় পরস্পরবিরোধী বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বিশেষত উচ্চশিক্ষা, চাকরি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তায় অনেক যুবক-যুবতী বিবাহকে পিছিয়ে দেয়। কেউ মনে করে বিয়ে করলে ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে, আবার কেউ মনে করে ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করা উচিত নয়। এর

ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিয়েতে অযথা বিলম্ব ঘটে, যা বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম জ্ঞানার্জন, কাজ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে নিরুৎসাহিত করে না; বরং হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। তবে ইসলাম এ কথাও শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়াবি সফলতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন, চারিত্রিক পবিত্রতা ও পারিবারিক স্থিতিশীলতার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তাই ক্যারিয়ারের অজুহাতে বিয়েকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

বর্তমানে অনেক তরুণ-তরুণী দীর্ঘ সময় অবিবাহিত থাকার কারণে হারাম সম্পর্ক, মানসিক অস্থিরতা ও পারিবারিক টানাপোড়েনের শিকার হচ্ছে। আবার অনেক পরিবার অতিরিক্ত আর্থিক স্থিতি বা উচ্চ সামাজিক অবস্থানকে বিয়ের শর্ত বানিয়ে বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। অথচ ইসলামে বিবাহকে সহজ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষা বা ক্যারিয়ার ছেড়ে দিতে হবে। বরং বিয়ে ও ক্যারিয়ারের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখাই হলো উত্তম পন্থা। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহযোগী হলে উভয়েই দ্বীন, পরিবার ও কর্মজীবন সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে। পারস্পরিক বোঝাপড়া, দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি দাম্পত্য জীবন যেমন সফল হতে পারে, তেমনি ক্যারিয়ারেও উন্নতি অর্জন করা সম্ভব।

অতএব, ক্যারিয়ার ও বিয়েকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং পরস্পর পরিপূরক হিসেবে দেখা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ভারসাম্যপূর্ণ জীবনই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য কল্যাণকর।

৫.৫ যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন

যৌতুক বর্তমান সমাজের একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। বিবাহের সময় কনের পক্ষ থেকে অর্থ, আসবাবপত্র, যানবাহন বা বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস দাবি করাকে যৌতুক বলা হয়। ইসলামে বিবাহকে সহজ ও বরকতময় করার নির্দেশ দেওয়া হলেও সমাজে অনেক ক্ষেত্রে বিয়েকে অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যম বানানো হয়েছে। এর ফলে অসংখ্য নারী নির্যাতন, মানসিক কষ্ট এবং পারিবারিক অশান্তির শিকার হচ্ছে।

ইসলামে যৌতুকের কোনো অনুমোদন নেই। বরং ইসলাম নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মোহরানাকে স্বামীর দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছে। কিন্তু সমাজে উল্টোভাবে কনের পরিবারের উপর বিভিন্ন দাবি চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

যৌতুকের কারণে অনেক পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আবার অনেক মেয়ের বিয়ে বিলম্বিত হয়। এমনকি বিয়ের পরও যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অনেক নারীকে অপমান, মারধর, এমনকি তালাক পর্যন্ত দেওয়া হয়। এসব নির্যাতন শুধু একটি পরিবারের শান্তি নষ্ট করে না; বরং পুরো সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভালোবাসা, দয়া ও সম্মানের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

‘তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।’

— সূরা রুম : ২১

তাই পারিবারিক জীবনে নির্যাতন, অপমান ও জুলুমের কোনো স্থান নেই। একজন স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা এবং তার অধিকার আদায় করা। অনুরূপভাবে স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর প্রতি সম্মান ও সহযোগিতামূলক আচরণ করা। যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে। বিয়েকে সহজ করা, দীনদারিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অধ্যায়-৬:উপসংহার

ইসলামী পারিবারিক আইন মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বিধান। পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি, আর এ ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য ইসলাম অত্যন্ত সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব, মোহরানা, ইদত, সন্তান লালন-পালন, উত্তরাধিকারসহ পারিবারিক জীবনের প্রতিটি বিষয় কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমান আধুনিক সমাজে পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সংকট ও চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। হারাম সম্পর্ক, পরকীয়া, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, দায়িত্বহীনতা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে পরিবার ব্যবস্থা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে সমাজে অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ গবেষণায় ইসলামী পারিবারিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং আধুনিক সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে পরিবারে পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, সম্মান ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী হিসেবে জীবন পরিচালনা করলে পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজও কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়।

অতএব, আধুনিক সমাজের নানা সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামী পারিবারিক শিক্ষার অনুসরণ অত্যন্ত জরুরি। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সবক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই একটি সুন্দর, আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব।